ভূমিকা

বাংলা স্নাতকোত্তর স্তরের প্রথম সেমেস্টারের PGBNG-CC-1-4 পত্র— 'আধুনিক কাব্য-কবিতা'-এর মডিউল-৩-এর পঠিত বিষয়—

জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা—
নির্বাচিত কবিতা— 'মৃত্যুর আগে', 'বোধ', 'ক্যাম্পে', 'পাখিরা', 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি', 'এখানে আকাশ নীল', 'বনলতা সেন', 'সুরঞ্জনা', 'সিন্ধুসারস', 'বিড়াল', 'আট বছর আগের একদিন', '১৯৪৬-৪৭', 'এইসব দিনরাত্রি', 'ঘোড়া', 'অদ্ভুত আঁধার এক', 'আলো পৃথিবী'।

ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে নির্মিত বর্তমান সহায়ক আলোচনার উদ্দেশ্য— জীবনানন্দ দাশের কবিতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান। রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতায় অন্যতম প্রধান ও সর্বাপেক্ষা আলোচিত কবি হলেন জীবনানন্দ দাশ। তাঁর রোমান্টিকতা-প্রকৃতিচেতনা-মৃত্যুচেতনা-সময়চেতনা-সমাজচেতনা— এই সব কিছুই তাঁকে সমকালের অন্যান্য কবিদের তুলনায় স্বতন্ত্র করে তুলেছিল। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হল 'মহাপৃথিবী'। এই গ্রন্থের একটি বহুপঠিত ও বহুবিতর্কিত কবিতা হল 'আট বছর আগের একদিন'। এই কবিতায় নামহীন এক মানুষের আত্মহননের কাহিনি, তার আশা-আকাঙ্ক্ষার ইতিহাস কবি ব্যক্ত করেছেন। এই কবিতা আত্মজৈবনিক কবিতা। এই কবিতার বিষয়বস্তু ও অন্যান্য দিক নিয়ে বর্তমানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

এই বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দীপ্তি ত্রিপাঠীর 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়', বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা', অম্বুজ বসুর 'একটি নক্ষত্র আসে', জহর সেনমজুমদারের 'শিকারী পরিবৃত জীবনানন্দ', জীবনানন্দ: অন্ধকারের চিত্রনাট্য', তরুণ মুখোপাধ্যায়ের 'কবি জীবনানন্দ: অনুভবে অনুধ্যানে' ইত্যাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

— ড. মানস কবি
সহযোগী অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ
ও
বারসার,
আশুতোষ কলেজ।

আধুনিক বাংলা কাব্য

কবি জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা

'আট বছর আগের একদিন'

রবীন্দ্রোত্তর কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশ। বাংলার কাব্য-জগতে কবি জীবনানন্দ এনে দিয়েছেন এক সম্পূর্ণ নতুন সুর যা একান্তভাবেই স্বপ্নিল ও স্পর্শ-রূপ-গন্ধময়। 'এক বিমূঢ় যুগের বিভ্রান্ত কবি' – 'নির্জনতার কবি' জীবনানন্দের কাব্য পৌষের চন্দ্রালোকিত মধ্যরাত্রির কুহেলি-কুহকের সঙ্গে তুলনীয়। কবির রোমান্টিকতা-মৃত্যুচেতনা-প্রকৃতিচেতনা-সময়চেতনা-সমাজচেতনা – এই সব কিছুই তাঁকে সমকালীন অন্যান্য কবিদের তুলনায় করে তুলেছিল স্বতন্ত্র। সামগ্রিক এক নিজস্ব কবিসত্তা নিয়েই কবি জীবনানন্দ দাশ স্বয়ংসম্পূর্ণ এক কবিতা-বিশ্বের অধীশ্বর। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হল 'মহাপৃথিবী' (১৯৪৪ খ্রিঃ)। এই কাব্যগ্রন্থেরই একটি বিশিষ্ট তথা বহু-আলোচিত ও বহু-বিতর্কিত একটি কবিতা হল 'আট বছর আগের একদিন'। কবিতাটি বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

নামহীন এক মানুষের আত্মহননের কাহিনি – তার চাওয়া-পাওয়ার ইতিহাস এই কবিতায় ব্যক্ত করেছেন কবি। কবিতার কথক অথবা কবি শুনেছেন সেই মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে লাশকাটা ঘরে। প্রকৃতি যখন রঙিন সাজে সেজে উঠেছে, গতকালের তেমনই এক ফাল্গুন মাসের রাত্রের অন্ধকারে যখন পঞ্চমীর চাঁদ ডুবে গিয়েছিল তখনই সেই নামহীন মানুষটির হৃদয়ে মরবার আকাঙ্ক্ষা জন্মেছিল –

''কাল রাতে – ফাল্গুনের রাতের আঁধারে
যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হল তার সাধ।''

সাধারণভাবে তার মৃত্যুর কারণ খুঁজে পাওয়া দুর্জ্ঞেয়। সামাজিক জীবনে সাধারণত একটি মানুষ যা-যা পেলে সুখী হয়, সেই মানুষটির সেই সব কিছুই ছিল। মায়াবী রঙিন রাতে তার 'বধূ শুয়ে ছিল পাশে – শিশুটিও ছিল; প্রেম ছিল, আশা ছিল'। তবুও সেই মায়াবী জ্যোৎস্নায় সে কোন্ 'ভূত' দেখল – কেন তার ঘুম ভেঙে গেল? কিংবা বহু রাত্রিই সে বিনিদ্র ভাবে কাটিয়েছে। মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতেই সে হয়তো 'লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার।'

এমন ঘুমই বোধ হয় সে চেয়েছিল। মৃত্যুর এই ভয়ংকর বীভৎসতার রূপ আঁকতে গিয়ে কবি বলেছেন –

''রক্তফেনা-মাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজি
আঁধার ঘুঁজির বুকে ঘুমায় এবার।''

– কোনোদিনই সে আর জাগবে না।

'চাঁদ ডুবে চলে গেলে – অদ্ভুত আঁধারে' যেন তার জানালার কাছে উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধতা এসে বলেছিল, – 'কোনোদিন জাগিবে না আর, জাগিবার গাঢ় বেদনার অবিরাম ভার' আর তাকে সহ্য করতে হবে না। জেগে থাকার বা জানার সমস্ত ইচ্ছা সে হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু এই মানুষটি যখন মরতে চেয়েছে তখন অন্যদিকে দেখা যায় মনুষ্যেতর প্রাণী পেঁচা জেগে থাকে – 'গলিত স্থবির ব্যাঙ' আরও একটি দিনের আলো দেখবার জন্য – জৈব আসক্তির জন্য বেঁচে থাকার প্রার্থনা জানিয়েছে।

কবি বুঝতে পারেন, যূথচারী অন্ধকারের গাঢ় নিরুদ্দেশে 'মশারীর ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা' সত্ত্বেও এক ফোঁটা রক্তের আশায় দল বেঁধে মশারা ঘুরে বেড়ায় – 'জীবনের স্রোত ভালোবেসে'। আবার জৈবিক সুখ পরিতৃপ্তির জন্য একইভাবে বেঁচে থাকে মাছি। শরীরের পচা 'রক্ত ক্লেদ' থেকে রৌদ্রের আনন্দে মাছি উড়ে বেড়ায়। এমনি ভাবেই সোনালি রোদের মধ্যে খেলে বেড়ায় 'উড়ন্ত কীট'। খাদ্য অন্বেষণ, প্রজনন, জৈবিক সুখ – এর বাইরে আর কোনো সুন্দর জীবন এই সমস্ত মনুষ্যেতর প্রাণীর নেই। এরা বাঁচতে চায়, জৈবিক সুখ চায়। অথচ সেই মানুষটির মরবার সাধ হল। মানুষের জীবনের সঙ্গে ফড়িঙের-দোয়েলের জীবনের যোগ নেই ভেবেই সেই মানুষটি যৌবন-রাঙা বসন্তের রাতে চাঁদ ডুবে যাওয়ার পর অন্ধকারে একা-একা অশ্বত্থ গাছের তলায় একগাছা দড়ি নিয়ে গিয়েছিল আত্মহত্যা করতে।

'অশ্বত্থ-শাখা' কিংবা সোনালি ফুলের স্নিগ্ধ বাঁকে উড়ে-বেড়ানো 'জোনাকির ভিড়' কেউই কি মানুষটির আত্মহত্যার প্রতিবাদ জানায় নি? তারা কি বলেনি তাকে এই মায়াময় পৃথিবীতে থেকে যেতে? 'থুরথুরে অন্ধ পেঁচাও বেঁচে থাকতে চায় – 'বুড়ি চাঁদ' ডুবে গেলেই সে দু-একটি ইঁদুর ধরার জন্য অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্ধকারে পেঁচা মানুষটিকে বেঁচে থাকার জন্য নানানভবে অনুপ্রাণিত করেছে। তবু জীবনের ওই স্বাদ – হেমন্তের বিকেলের সুপক্ক ঘরের মায়াময় গন্ধ তার কাছে অসহ্য মনে হয়েছে। জৈবিক জীবন তার কাছে মূল্যহীন মনে হয়েছে। মর্গের গুমোটে থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে সেই তপ্ত হৃদয় কখনও শান্ত হতে পারে না – তবু সেই পথেই পা-বাড়ানো মানুষটি।

কবি অথবা এ কবিতার কথক সেই মৃত মানুষটির গল্পই বলে চলেন। নারীর প্রণয়ে সে ব্যর্থ হয়নি। বিবাহিত জীবনের কোনো সাধ তার

অপূর্ণ থাকেনি। সুন্দরী বধূ ছিল তার 'মননের মধু'। সে তাকে শারীরিক এবং মানসিক ভাবে তৃপ্তিও দিতে পেরেছিল। 'হাড়হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে' তার জীবন কোনোদিন কেঁপে ওঠেনি। তথাপি তাকে আত্মহননের পথ বেছে নিতে হল – আর তাই দেখা যায় 'লাশকাটা ঘরে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে' সে 'টেবিলের 'পরে'।

মানুষটির এই আত্মহত্যার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কবি বা কথক জানিয়েছেন – সুন্দরী স্ত্রী, নারীর হৃদয়ের ভালোবাসা, প্রেম, শিশু, গৃহ, অর্থ, কীর্তি, স্বচ্ছলতা – এটাই জীবনের শেষ কথা নয়। মানব অস্তিত্বের গভীর এক সংকটের কথা বলেছেন কবি বা কথক – বলেছেন –

''আরও এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত – ক্লান্ত করে;''

কিন্তু মৃত্যুর ভিতরে সেই ক্লান্তি নেই ভেবে মানুষটি লাশকাটা ঘরে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের উপরে। সব থেকেও মানুষটি চূড়ান্ত অভাববোধের হীনমন্যতায় ভুগেছে। সৃষ্টির অসহ্য-যন্ত্রণায় সে অবসন্ন হয়েছে।

মানুষটি যখন মৃত্যুর অন্ধকারে লাশকাটা ঘরে বন্দী আছে তখন যে অশ্বত্থ গাছে সে দড়ি নিয়ে গিয়েছিল আত্মহত্যা করতে, সেখানকার এক অশ্বত্থ ডালে বসে 'থুরথুরে অন্ধ' পেঁচাটি চোখ পাল্‌টে বলেছে –

''..... 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে ?
চমৎকার।
ধরা যাক দু'-একটা ইদুঁর এবার –''

পেঁচা অন্ধ ও বৃদ্ধ, তবু তার বেঁচে থাকার এবং জীবন উপভোগের স্পৃহা বিন্দুমাত্র কমেনি – অথচ মানুষটি খুব সহজেই এ জীবনকে ছেড়ে দিল।

কবি বা কবিতার কথক কবিতার শেষে জীবনের গভীর সত্যকে ব্যক্ত করেছেন। অন্ধ-বৃদ্ধ পেঁচাকে 'প্রগাঢ় পিতামহী' সম্বোধন করে বলেছেন, জীবনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বয়সের এই ভোগাকাঙ্ক্ষাকে 'চমৎকার' বলে ব্যঙ্গ করেছেন। জ্ঞানবৃদ্ধ 'প্রগাঢ় পিতামহী'র কাছে এ জীবন সুখময় মনে হয়েছে। তিনিও একদিন তার মতো বৃদ্ধ হবেন এবং মায়াময় চাঁদকে 'কালীদহের বেনো জলে' পার করে দেবেন। তারপর শেষে দু'জনে মিলে 'জীবনের প্রচুর ভাঁড়ারে'র জাগতিক সুখ ছিনিয়ে নিয়ে এবং শূন্য করে, তারা এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবেন।

আলোচ্য 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় দেখা যায় জৈব জীবন ও চৈতন্যময় জীবন – এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে আত্মহননকারী মানুষটি অনুভব করেছেন – 'বিপন্ন বিস্ময়'। সব কিছু থাকার পরেও কেন তার এই আত্মহত্যার আয়োজন ? জীবনের ভাঁড়ার পূর্ণ থাকার পরেও যে 'বিপন্ন বিস্ময়' লোকটির অন্তর্গত রক্তকে আলোড়িত করেছে। কবিতাটির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে 'উটের গ্রীবার স্তব্ধতা', 'জ্যোৎস্নায় ভূত দেখা' – এ সব কিছুরই সারকথা হল 'বিপন্ন বিস্ময়'। কবিতার স্তবকগুলিতে ব্যাঙের উষ্ণ অনুরাগ, মশাদের জীবনের স্রোত ভালোবাসা, বৃদ্ধ-অন্ধ পেঁচার গাঢ় সমাচার, কীট-পতঙ্গ-পাখিদের বিকীর্ণ জীবন – মানুষটির অসহ্য বোধ হয়েছে। মনে হয়েছে – 'যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলে'র মানুষ তার নাগাল পেতে পারে না। বর্তমান শুধু ব্যথাময় – 'বেদনার আমরা সন্তান'। এই পার্থিব জীবনে আবর্তন আছে, বিবর্তন নেই। অথচ সকলেই এমন জীবনেরই প্রত্যাশী। এই জীবন-প্রত্যাশা – অস্তিত্বের ধারণাই এখানে 'বিস্ময়'। জীবনানন্দের 'বোধ' কবিতায় দেখা যায় –

''আলো-অন্ধকারে যাই – মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, – কোন্ এক বোধ কাজ করে।
স্বপ্ন নয় – শান্তি নয় – ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয় !''

– কবি এই 'বোধ'কে উপেক্ষা করতে পারেন নি। এই 'বোধে'র কাছে কবি অসহায়। এই বোধের তাড়নাই মানুষকে করে তোলে অবসন্ন – এর সঙ্গে নিয়ত সংগ্রামে কবি ক্লান্ত। তাই আত্মহত্যাকারী মানুষটির প্রতি কবি সমব্যথী। এই 'বোধ'ই এখানে 'বিস্ময়'। কিন্তু প্রশ্ন হল এই বিস্ময়ের বিপন্নতার কারণ কী ? – জীবনের সব পাওয়া মানুষটির পূর্ণ হয়েছে বলেই তার চেতনা লুপ্ত হয়নি – আর সেজন্যই সকল প্রাপ্তির মধ্যেও মানুষটি 'কোন্ ভূত'কে দেখেছে – তার ঘুম ভেঙে গেছে। এই ঘুম-ভেঙে যাওয়া তার চৈতন্যের জাগরণের প্রতিই ইঙ্গিত করেছে। আর ঘুম ভেঙে 'ভূত' দেখা অর্থাৎ অতীতের বিষণ্ণতার পরিক্রমণেই সে ক্লান্ত – অন্তরে বিনিদ্র। এই 'ভূত' বা কোনো প্রশ্নময় যন্ত্রণাময় অতীত – 'বিস্ময়' তাকে নিয়ত ক্লান্ত করেছে বলেই এই ক্লান্তির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই তার আত্মহত্যা। এই

আত্মহত্যা যেমন বিষাদজনিত আবার তেমনি শারীরিক ও মানসিক অবসাদ থেকেও সম্ভব বলে মনে হয়। সমাজের সকলের থেকে – সর্বোপরি নিজের থেকে পৃথক করে আত্মোপলব্ধির পথে আত্ম-সাক্ষাৎকারের বিপন্নতা থেকে মুক্তি পেতেই এই মানুষটি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। সমালোচক বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায় তাই যথার্থই বলেছেন –

> ''প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের চৈতন্য একটি বিস্ময়, কিন্তু সেই বিস্ময় সকল সময় বিপন্ন, কেননা তার চারিপাশে জড়তার বেষ্টন যেখানে নিজের অপূর্বতার বিস্ময়ের লেশমাত্র সমর্থন নেই।'' ['আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা']

জীবনানন্দ মৃত্যু-প্রেমিক কবি। তাঁর চেতনায় মানুষের পার্থিব জগতের মধ্যে হঠাৎ বিপন্নতাজনিত জাগরণ বা আত্ম-অস্তিত্বের উপলব্ধি যদি 'চৈতন্য' হয় আর মৃত্যু যদি 'মগ্ন চৈতন্যে'র প্রতীক হয় তাহলে চৈতন্যের মগ্ন চৈতন্যের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে আবার গভীরভাবে ফিরে পাওয়ার ব্যঞ্জনাও এই মানুষটির আত্মহত্যার মধ্যে আভাসিত। একদিকে জৈব জীবন ও অন্যদিকে চৈতন্যময় জীবন – একদিকে 'জীবনের স্রোত' ও অন্যদিকে 'লাশকাটা ঘরে'র মাঝখানে এভাবেই দ্বিধা-জর্জরিত মানুষটি যে মহৎ অনুভূতি তথা উপলব্ধিতে উন্নীত হয়েছে কবি তাকেই 'বিপন্ন বিস্ময়' বলে অভিহিত করেছেন তাঁর 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় যা একান্তই কবি জীবনানন্দ দাশের কবিসত্তার অন্তর দর্শনে উত্তীর্ণ হয়েছে।